প্রথম আলো

তারিখ ... 30 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বাস্তবায়ন সমস্যার দায় শুধু শিক্ষকদের নয়

## সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। এরই মধ্যে সরকারি এক গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪১ শতাংশ শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন না। ১৪ অক্টোবর *প্রথম আলোয়* 'সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতির সমস্যা কী?' এ বিষয়ে শিক্ষক আবু রইসের একটা লেখা পড়লাম। তিনি সৃজনশীল পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের পথে অন্য কিছু সমস্যার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবকে বড় অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণের সুযোগ নেই। ৩৪ বছরের কলেজ-শিক্ষকতার জীবনে শিক্ষাদান, ৩০ বছরের উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যবই রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় এ বিষয়ে ক্ষুদ্রজ্ঞানে আসা পর্যবেক্ষণ তুলে ধরলে সমস্যার কারণ বুঝতে কিছুটা হয়তো বা সহায়ক হবে মনে করেই এ লেখা।

শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মূলে থাকে পাঠ্যবই। এসব বই যেন শিক্ষা কারিকুলামের উদ্দেশ্য পূরণ করে, এ জন্য ১৯৯৮-৯৯ সেশন থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন সিলেবাস ও প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন করে ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রথমবারের মতো এইচএসসি পর্যায়ে পাঠ্যবই অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ জন্য সিলেবাস প্রণয়ন করে তা প্রকাশ করে লেখক ও প্রকাশকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যা মেনে বই জমা হয়। প্রতিটি বই তিনজন মূল্যায়নকারী আলাদাভাবে প্রতি অধ্যায়ে নম্বর দিয়ে বইয়ের মান মূল্যায়ন করেন। ক্লাস শুরুর বেশ আগেই এনসিটিবি নতুন সিলেবাস বই বের করে তাতে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ১, ২, ৩—এভাবে বই লেখকদের নাম প্রকাশ করে প্রতিটি কলেজে তা পাঠায়। ফলে ক্লাস শুরুর বেশ আগেই লেখক ও প্রকাশকেরা পাঠ্যবইয়ের সৌজন্য কপি শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দিতে সমর্থ হন। এতে শিক্ষকেরা স্বচ্ছন্দে প্রথম দিন থেকে নতুন বই নিয়ে ক্লাসে যেতে সমর্থ হন।

উল্লেখ্য, এই সিলেবাসের সঙ্গে যে প্রশ্নপদ্ধতি দেওয়া হয়, তাতে রচনামূলক প্রশ্নে ৬০ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নে ৪০ (কোনো কোনো বিষয়ে কিছুটা ভিন্নতা ছিল) রাখা হয়। এতে বোর্ড পরীক্ষায় প্রতিটি পত্রে ছোট-বড় মিলিয়ে ১৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে বলে শিক্ষার্থীদের জানানো হয়। উল্লেখ্য, এর আগে প্রদত্ত সিলেবাসে প্রশ্নের উত্তর করতে হতো বিষয়ভেদে পাঁচ থেকে সাতটি। তাই নতুন সিলেবাসে শিক্ষার্থীদের আগের চেয়ে বেশি পড়ার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালুর সময় এ পদ্ধতির উপযোগী বই লেখানোর বিষয়টি একেবারেই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়ন নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ সম্পর্কে একটু লিখতে চাই। এতে হয়তো পাঠকদের প্রকৃত সমস্যা বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে। ২০০৭ সালের ৬ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে নতুন কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের জন্য (এমসিকিউয়ে ৪০ ও সিকিউয়ে ৬০ নম্বর) ঘোষণা দেয় এবং ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা থেকে তা কার্যকর হবে বলে জানায়। ২০০৮ সালের ৩০ এপ্রিলে ইস্যুকৃত মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনবলে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের স্থলে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নামে আগে দেওয়া ঘোষণার কিছু সংশোধন করে ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় শুধু বাংলা ও ধর্মশিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ২০০৯ সালের ১ জুলাইয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ছয়টি বিষয়ে এবং ২০১০ সালের ২২ মার্চের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০১২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১১টি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর করা হয়। পরে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর প্রজ্ঞাপন দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা রয়েছে, সে ব্যাপারে আমি আমার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরছি:

১. সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়নি: সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে মুখস্থনির্ভর গতানুগতিক পদ্ধতির মতো সিলেবাস বড় হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু এ পর্যায়ে প্রশ্নপদ্ধতি পরিবর্তন করা হলেও আগের বড় সিলেবাস বহাল রাখা হয়। তাই সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি ও পাঠদান যেমন প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও সমস্যার সম্মুখীন হয়।

২. আগের পদ্ধতিতে লেখা বই: সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পাঠ্যবই সৃজনশীল হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার্থী যেন বই পড়ে নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে, সেভাবে বই লিখতে হয়। কিন্তু আগের পদ্ধতির অনুসরণে লেখা বই সেই প্রয়োজন পূরণ করেনি।

৩. দেরিতে বই পৌঁছানো: ২০১১-১২ সেশনের উচ্চমাধ্যমিকের ক্লাস শুরু হয় ১ জুলাই ২০১১-তে। প্রকাশনাজগতের নিয়ম অনুযায়ী বইয়ের কাজ শুরু হওয়ার কথা জানুয়ারি থেকেই। পরিমার্জন, সংস্করণ, ছাপা, বাঁধাইয়ের পর সৌজন্য বই পাঠানো শুরু হয় মে মাসে। বাজারে বই যায় জুনে। ১ জুলাই থেকে বইয়ের দোকানগুলো বই বিক্রির জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ২০১১ সালের ৫ জুলাই জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, ২০১৩ সালের পরীক্ষায় পৌরনীতি, রসায়ন এবং ব্যবসায়নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। অর্থাৎ ২০১১-১২ সেশন থেকে পাঠ শুরু হবে। যার পাঁচ দিন ইতিমধ্যে চলে গেছে। লেখকদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই, নতুন পদ্ধতি জানা নেই। প্রজ্ঞাপন পাওয়ার পর তাঁরা তড়িঘড়ি করে প্রশ্ন সংযুক্ত করলেন। প্রশ্নসহ বই পৌঁছাল দুই মাস পরে সেপ্টেম্বরে।

৪. দেরিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু: সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি একটা কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি। এখানে নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে থেকে একজন শিক্ষককে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। তাই এই কাঠামোকে যেমন তাত্ত্বিকভাবে বোঝা প্রয়োজন, তেমনি প্রশ্ন করতে করতে এটা ভালোভাবে শেখা যায়। এ জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। তবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে দেরিতে। বাছাইকৃত শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয় সম্ভবত ২০১১ সালের ডিসেম্বর থেকে। আর সাধারণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় মার্চ ২০১২ থেকে। সাধারণ শিক্ষকদের মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষণ। নতুন কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি তিন দিনে বুঝে শিক্ষক বিজ্ঞ হয়ে গেছেন বলে যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে থাকে, তবে এখানে বড় ভুল হয়ে গেছে।

৫. বোর্ডের দুর্বল প্রশ্নমান: সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির আদর্শ মান উপস্থাপন করতে পারেনি: ২০১৩ ও ২০১৪ সালের বোর্ড প্রশ্ন সব বোর্ডে একক প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হয়। সিলেবাস অনেক বড় হওয়ায় প্রশ্ন তৈরি করা কষ্টকর ছিল। ২০১৫ সালে নতুন সিলেবাসে প্রতিটি বোর্ড আলাদা প্রশ্ন করে। এতে কোনো কোনো বোর্ডের প্রশ্নমান এতই দুর্বল হয় যে তা সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণে ব্যর্থ হয়। অবশ্য ২০১৬ সালের বোর্ড প্রশ্নে এটা কমেছে এবং প্রশ্নের মান কিছুটা বেড়েছে।

৬. বেশি নম্বর দেওয়ার প্রচ্ছন্ন নির্দেশ: সৃজনশীল প্রশ্নে একজন শিক্ষার্থী ভালো করলে যেমন ১০০-তে ১০০ পেতে পারে, খারাপ করলে ০ বা ১০-ও পেতে পারে। কিন্তু যখন নির্দেশ দেওয়া হয়, উত্তরপত্রের উত্তর কোনো রকমে ধারেকাছে গেলেই নম্বর দেবেন, তখন খাতা মূল্যায়নকারী ধারেকাছে গেল কি না, তা খুঁজে দেখার প্রয়োজন ততটা বোধ করেন না। যা বোঝার বুঝে নিয়ে নম্বর দিয়ে দেন। অথচ সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে নম্বর অঙ্কের মতো দেওয়া যায়। এভাবে শুরুতে নম্বর দিলে শিক্ষার্থীরাও আন্তরিক হতো ও লেখাপড়া করত। শিক্ষকেরাও সৃজনশীল পদ্ধতিকে এর মধ্য দিয়ে বুঝে নিতে পারতেন। কিন্তু তা হলো না।

৭. শিক্ষক নেই: নতুন সিলেবাসে বেশ কিছু নতুন বিষয় খোলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। বেসরকারি কলেজগুলো শিক্ষক নিয়োগ দিলেও ডিজি অফিস নানান কথা বলে তাদের এমপিওভুক্ত করছে না। বছরের পর বছর শিক্ষকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। তাঁদের সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝার ও পাঠদানের মতো মনমানসিকতা লুপ্ত হচ্ছে।

যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই দ্রুততার সঙ্গে এ ধরনের একটা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিন্তা ও গবেষণার অভাব, সক্ষমতা বিবেচনায় ব্যর্থতা, শিক্ষকদের জন্য যথাসময়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নিতে না পারা এবং সৃজনশীলতা সৃষ্টির উপযোগী টেক্সট বই নিশ্চিত না করে নতুন পদ্ধতি চালুর কাফফারা জাতিকে অনেক দিন দিতে হবে।

● মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান: অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা সিটি কলেজ।
md.khalequzzaman1@gmail.com